ইতিহাস অন্বেষণ

৩

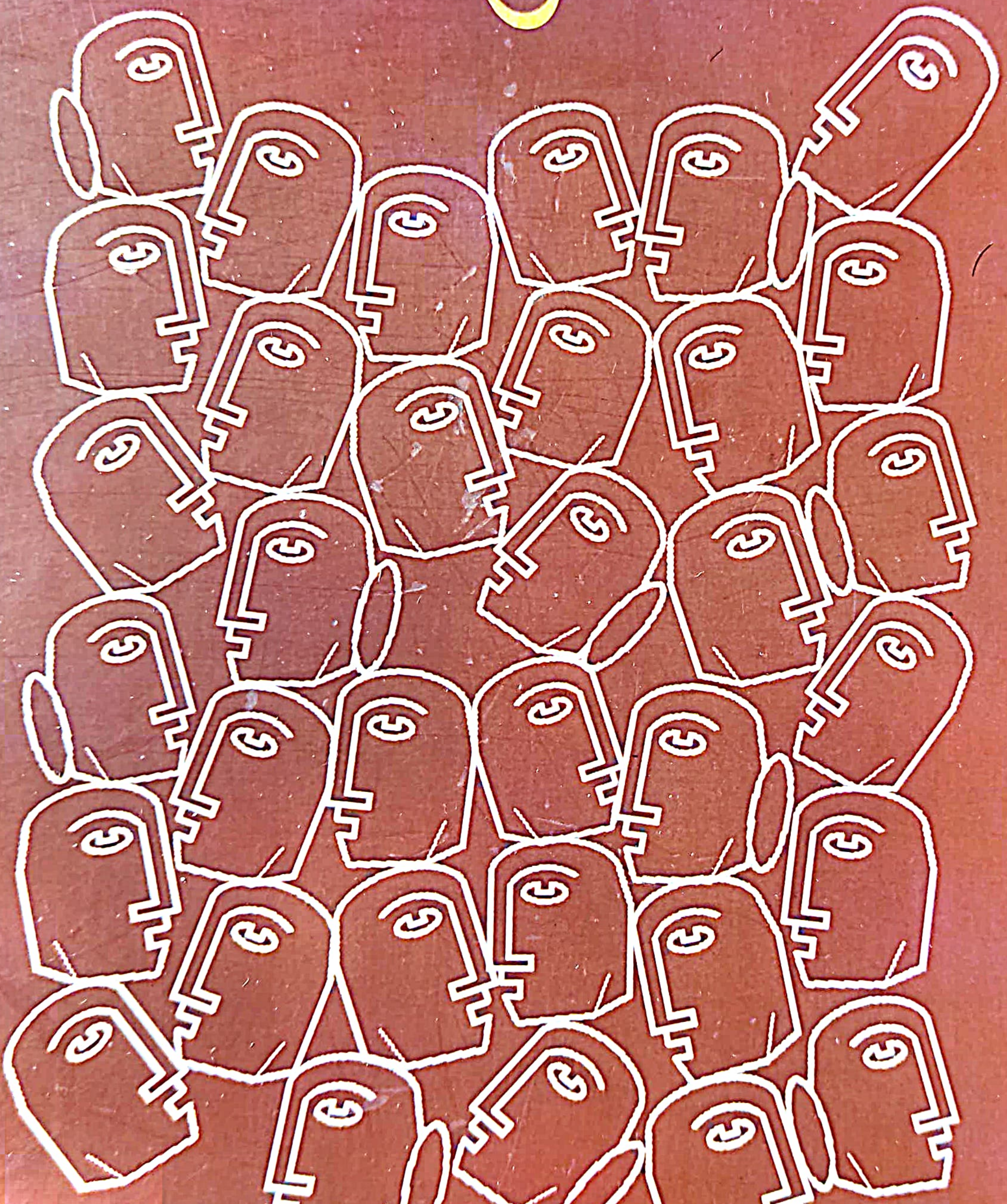

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল

কলকাতা - ৭০০০৮৪

ISBN : 978-93-93490-56-8
Vol. 3, Year 2026

ইতিহাস অন্বেষণ

তৃতীয় বার্ষিকী আন্তর্জাতিক স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত
নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

তৃতীয় খণ্ড, বর্ষ ২০২৬

সম্পাদনা
অধ্যাপক সন্দীপ বসু সর্বাধিকারী
রাজেশ বিশ্বাস
জাহাঙ্গীর বিশ্বাস
কিংশুক ভট্টাচার্য

গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল
কলকাতা ৭০০০৮৪

ITIHAS ANWESHAN
The Peer-reviewed Proceedings Volume of Third International Annual Conference on
Tradition & Modernity : The South Asian Chapter

ISBN : 978-93-93490-56-8

Vol. 3, Year 2026
G.S.S.M.P. 2026

Garia Society for Studies of Marginal People
[Reg. No. S0014623 of 2020-2021]
455, Sreerampur Road, Garia, Patuli, Kolkata – 700 084
Email : editorjphc2015@gmail.com

Rs. 900/-

ইতিহাস অন্বেষণ
তৃতীয় বার্ষিকী আন্তর্জাতিক স্তরের ইতিহাস সম্মেলন-এ পঠিত বিশেষজ্ঞ শংসায়িত
নির্বাচিত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ সংকলন

তৃতীয় খণ্ড, বর্ষ ২০২৬

প্রকাশক
গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস্ অব মার্জিনাল পিপল
৪৫৫, শ্রীরামপুর রোড (পূর্ব), গড়িয়া
কলকাতা ৭০০০৮৪

মুদ্রণ
গ্রাফিক প্রিন্ট অ্যান্ড পাবলিসিটি
৩এ, মানিকতলা ইন্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট
কলকাতা ৭০০০৫৪

গ্রন্থস্বত্ব
গড়িয়া সোসাইটি ফর স্টাডিস অব মার্জিনাল পিপল ২০২৬

মূল্য - ৯০০ টাকা মাত্র

ঐতিহ্য ও আধুনিকতা : দক্ষিণ এশীয় ধারা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা ও প্রেক্ষিত ১৭-১৮

বিশেষ প্রবন্ধ

১. পাকিস্তানের শেষ চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ও রাজমাতা বিনিতা রায়
আনন্দগোপাল ঘোষ ১৯-৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারতের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তিকতার ধারণা

২. প্রান্তিক মহিলাদের ওপর পুলিশি নির্যাতন (১৯৩০-১৯৩২) : একটি পর্যালোচনা
তন্ময় মালাকার ৪৪-৫১

৩. আঞ্চলিক ইতিহাসের আলোকে একটি উদ্বাস্তু কলোনির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ
অভীক ভঞ্জ ৫২-৬৫

৪. ভাটপাড়া একটি মিল শহরের আর্থ-সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্ত
ড. শত্রুঘ্ন কাহার ৬৬-৭৮

৫. সামাজিক নৃবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে পটুয়া জনগোষ্ঠী
সৌরভ বেরা ৭৯-৮৮

তৃতীয় অধ্যায় : সামাজিক উত্তরণ : জাতিভেদ, অসমতা ও সামাজিক বাস্তবতা

৬. মানভূমের জনবিন্যাসে কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থান : ১৮৭২-১৮৯১
অভিজিৎ চ্যাটার্জ্জী ৮৯-১০৩

৭. হেলে ও জেলে কৈবর্ত থেকে মাহিষ্য ও তপশিলি জাতি আত্মপরিচয় নির্মাণ (১৮৭২-১৯৩৭)
ইন্দ্রজীৎ মন্ডল ১০৪-১১৩

ভাটপাড়া একটি মিল শহরের আর্থ-সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্ত

ড. শত্রুঘ্ন কাহার *

ভাটপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনার গঙ্গানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী নগর নৈহাটির পার্শ্ববর্তী ভাটপাড়া (আদিনাম ভট্টপল্লী) প্রাচীন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এখানে একের পর এক চটকল গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের প্রথম চটকল কাঁকিনাড়া জুটমিল (১৮৮৪)। ঔপনিবেশিক আমলে বিংশ শতকের গোড়ায় এখানে আরও বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও, ভাটপাড়া মূলত চট অঞ্চল (jute belt) বলে পরিচিত। ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৯৯ সালে গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে অঞ্চলটি শ্রমিকবহুল বসতি অঞ্চল হয়ে ওঠে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ণের নানা দিক যেমন আবাসন সমস্যা, নাগরিক পরিষেবা এবং পৌর রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তুত বাংলার হিন্দী ভাষী চটকল শ্রমজীবীদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিবিম্বই লক্ষ্য করা যায় ভাটপাড়া মিল শহরের শ্রমজীবীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। একদা সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পীঠস্থানরূপে পরিচিত ভট্টপল্লীর কালক্রমে ঔপনিবেশিক যুগে চটকল শহরে পরিণত হয়। পৌরসভা হিসাবে ভাটপাড়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৯৯ সালে। মূলত ১৮৯০ এর দশক থেকে উক্ত অঞ্চলের চটকলগুলিকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে শ্রমজীবীদের ব্যাপক অভিবাসন উক্ত অঞ্চলের অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি তথা রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অচিরেই ভাটপাড়া চতুর্থ বৃহত্তম পৌরসভায় পরিণত হয়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে চটকল শ্রমজীবীরা মূলত মিল কোয়ার্টার অথবা সর্দার বা জমিদার নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তি অঞ্চলে বসবাস করত। প্রাথমিকভাবে বস্তিগুলির অবস্থা ছিল করুণ, কুঁড়ে ঘরে অপর্যাপ্ত জায়গা, প্রয়ঃপ্রণালী, পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমজীবীদের জীবন অতিবাহিত করতে হত। পক্ষান্তরে মিল কোয়ার্টারগুলি ছিল তুলনায় উন্নত। স্বাধীনতা উত্তরকালে বস্তি অঞ্চলে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও, মিল কোয়ার্টারগুলির কোন ধরনের

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ই-মেল- skahar0072015@gmail.com

সংস্কার না হওয়া সেগুলি ক্রমশ আবাসের অযোগ্য হয়ে ওঠে। আবার ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তিগুলিকে কেন্দ্র করে জমিদারী ব্যবসাও ফুলে ফেঁপে ওঠে। এইরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে পৌরব্যবস্থা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। প্রাথমিকভাবে পৌরসভা পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তায় আলো, পয়ঃপ্রণালী, নলকূপ নির্মাণ, মহামারী প্রতিষেধন ইত্যাদিমত নাগরিক পরিষেবা দানে ব্রত ছিল। পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও স্থানীয় করদাতারাই প্রধান ভূমিকা পালন করত, তবে শ্রমজীবীরা করও দিতনা এবং পৌরসভা পরিচালনা ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকাও ছিলনা। মিল থেকে গৃহীত করই ছিল পৌরসভার প্রধান আয়, এর বাইরে ছিল গৃহস্থকর। শ্রমিক বসতি এলাকায় ঔপনিবেশিক যুগে ও তারপরেও সার্বজনীন ভোটাধিকার চালু হবার আগে পর্যন্ত পরিষেবা দানের ক্ষেত্রেও অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড়া কলকাতা থেকে ৩৫ কিমি উত্তরে গঙ্গানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। সড়কপথ, রেলপথ ও নদীপথে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে ভাটপাড়ার যোগাযোগ সহজসাধ্য। নৈহাটির পার্শ্ববর্তী ভাটপাড়া (আদিনাম ভট্টপল্লী) প্রাচীন বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এখানে একের পর এক চটকল গড়ে ওঠে। এই অঞ্চলের প্রথম চটকল কাঁকিনাড়া জুটমিল (১৮৮৪)। ঔপনিবেশিক আমলে বিংশ শতকের গোড়ায় এখানে আরও বহু শিল্পকারখানা গড়ে উঠলেও, ভাটপাড়া মূলত চট অঞ্চল (jute belt) বলে পরিচিত। বর্তমানে অবশ্য তার অনেকগুলি রুগ্ন, মুমূর্ষ অথবা চিরতরে বন্ধ।

১৮৯৯ সালে ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল আঁটপুর ও মূলাজোড় (শ্যামনগর) নিয়ে নৈহাটি পুরসভার বাইরে প্রথম ভাটপাড়া পুরসভা (Municipality) গঠিত হয়। পরে সুন্দিয়া গ্রামের পুরোটা এবং স্থিরপাড়া বা থিরপাড়া গ্রামের একাংশ এই পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে এই পুরসভায় ছিল তিনটি ওয়ার্ড ভাটপাড়া (ওয়ার্ড নং ১), কাঁকিনাড়া (ওয়ার্ড নং ২), জগদ্দল (ওয়ার্ড নং, ৩) পরে আঁটপুর ও মূলাজোড় নিয়ে গঠিত হয় ওয়ার্ড নং ৪।[১] ইতিমধ্যে ১৯১০ সালে গঠিত হয় জগদ্দল থানা। নৈহাটি থানা থেকে আলাদা করে সমস্ত ভাটপাড়া পৌর এলাকা ও সংলগ্ন গ্রামীণ এলাকা নিয়ে গঠিত হয় এই জগদ্দল থানা।[২] কালক্রমে ওয়ার্ডের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫টি। এই পুরাতন ২৫টি ওয়ার্ডের সঙ্গে ১৯৯৫ সালের সংযোজিত অঞ্চলগুলির ১০টি ওয়ার্ড যুক্ত করে পুরসভার মোট ওয়ার্ড সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫টি। এরফলে সমগ্র পুরএলাকাটি অধিকাংশ/সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাভাষী।[৩]

ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান ও চিরায়ত শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নৈহাটি-ভট্টপল্লী-মূলাজোড় শ্যামনগর ঠাকুর পরিবারের জমিদারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ এবং কালীবাড়ীর জন্য প্রসিদ্ধ। আঁটপুর ছিল একটি গ্রামীণ অঞ্চল। জগদ্দল ছিল একদা বিশাল বিশাল অট্টালিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত ধনী ব্যক্তিদের বাসস্থান। পরবর্তীকালে

এই অঞ্চলটি চটকল ও সংলগ্ন শ্রমিক বস্তিতে রূপান্তরিত হয়। ঠিক একইভাবে কাঁকিনাড়া যা ছিল একটি প্রাচীন জনপদ এবং পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সেখানে গড়ে ওঠে অধিকাংশ জুটমিল ও শ্রমিক বস্তি।[৪] উনিশ শতকের একেবারে শেষে ভাটপাড়া পৃথক পুরসভার মর্যাদা পাওয়ার সময় থেকেই ভাটপাড়ার পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় প্রধানত, উদীয়মান চটশিল্পের শহর হিসাবে।

ঔপনিবেশিক পর্ব (১৯৪৭ সাল পর্যন্ত)

ভাটপাড়া নগরীর এই চরিত্রগত রূপের পরিবর্তনের (transformation of character) মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বিংশ শতাব্দীর ভাটপাড়ার বিবর্তনের উৎস।

জনসংখ্যা : উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে একের পর এক চটকল স্থাপনের মধ্য দিয়ে উক্ত অঞ্চলের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (Demographic) চিত্রই বদলে যেতে থাকে। এই অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত ১৮৯১-২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যাগত সারণী থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৮৯১-১৯১১ সালের মধ্যে ভাটপাড়ার জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথম দশ বছরে (১৮৯১-১৯০১) ৮২.৫৫ শতাংশ এবং পরবর্তী দশ বছরে (১৯০১-১৯১১) ১৩৪ শতাংশ ছিল। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে শতাংশের হারে দশকে দশকে কিছুটা পার্থক্য হলেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের জনসংখ্যাগত চিত্র পরবর্তী উপবিভাগে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী-১

Population of Bhatpara

Census	Population	% of increase or Decrease
1891	11,764	-
1901	21,464	82.45%
1911	50,414	134.00%
1921	65,609	30.10%
1931	84,975	29.50%
1941	1,17,044	37.70%
1951	1,34,916	15.30%

Source : District Census Handbook North Twenty-Four Parganas, Census of India 2011, Series 20, Part XII A". Section II Town Directory, Pages 781-783 Statement I: Growth History, Pages 799-803. Directorate of Census Operations V, West Bengal. Retrieved 11 June 2018.

জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ ভাটপাড়াকে খুব দ্রুত বাংলার চতুর্থ বৃহত্তম নগরে পরিণত করে। কলকাতা, হাওড়া ও ঢাকার পরেই ছিল ভাটপাড়ার স্থান। ১৯২২ সালের ভাটপাড়া

মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে স্পষ্টতই বলা হয় "Needless to say that this absolutely a labour district where most of the people earn their livelihood either by working in the mills or by selling necessities to the mill labourers"।[৫] বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে দলে দলে লোক এই চটকলগুলিতে কাজ পাওয়ার জন্য ভিড় করতে থাকে এবং তাদের বাংলার চটকলে নিযুক্ত হওয়ার পেছনে যে নির্দিষ্ট ছক ছিল, তা সব চটকল অঞ্চলেই কাজ করত, যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলিতে আলোচনা করেছি, ভাটপাড়াতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কারখানায় কর্মরত কিছু শ্রমিক ছুটির পর দেশের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় নিজের সঙ্গে আত্মীয়পরিজন বা গ্রামের লোক নিয়ে আসত এবং কারখানায় তার অধীনে কাজে ঢুকিয়ে দিত। এরাই 'সর্দার' নামে অভিহিত হত। চটকলে কাজে নিযুক্তির প্রথম পর্বে শ্রমিকরা অনেকটাই সর্দারদের উপর নির্ভর করত। এইভাবে একটা দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক (client-patron relationship) তৈরি হত, যা অন্যান্য অঞ্চলের মত ভাটপাড়ার শ্রমিক জগৎকে অনেকটা প্রভাবিত করেছিল।

বাসস্থান : শিল্পাঞ্চলে গ্রাম থেকে এসে শ্রমিকরা প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হত তা হল বাসস্থানের সমস্যা। ভাটপাড়ায় আগত এই পরিযায়ী শ্রমিকদের আবাসস্থলের এক করুণ চিত্র পাওয়া যায় ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক রিপোর্ট থেকে।[৬] এই শ্রমজীবীদের কেন্দ্র করে দু'ধরনের আবাস গড়ে উঠেছিল। প্রথমত, মিল মালিকদের তত্ত্বাবধানে তৈরি মিল বস্তি বা মিল কোয়ার্টার এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তি (private Busteers)। এগুলির কিছু অংশের মালিক ছিল সর্দাররা আর কিছু অংশ ছিল বাঙালি জমিদারদের মালিকানাধীন। শ্রমিকদের এক ক্ষুদ্র অংশই মিল কোয়ার্টারগুলিতে জায়গা পেত। ১৯২৬ সালের ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক প্রতিবেদনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ পাবলিক হেলথ ডঃ বি. বি. ব্রহ্মচারীর এক রিপোর্টের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, সর্বাধিক ১২০০০ মানুষ স্থানীয় আবাসিক ছিল এবং ৭০০০ এর কিছু বেশ মানুষ মিল কোয়ার্টারে জায়গা পেয়েছিল, বাকিদের অর্থাৎ মোট প্রায় ৬০০০০ জন মিলের পাশে অবস্থিত কুঁড়ে ঘরের (Huts) বস্তিতে বাস করত। ঐ সময়ে ভাটপাড়া অঞ্চলে এইরকম বস্তির সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ টি।[৭]

এই সময়কার মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে মিল বস্তি বা কোয়ার্টার সম্পর্কে আরও বলা হয় যে, ভাটপাড়া পুরসভার অন্তর্গত মোট ১২টি চটকলের মধ্যে একমাত্র ক্রেইগ (craig) জুটমিল ছাড়া অপর সকল মিলেরই নিজস্ব কোয়ার্টার বা বস্তি ছিল। এই কোয়ার্টারগুলির মোট ঘরের সংখ্যা ছিল ৭৩৬২, যা অবশ্যই সব শ্রমিককে আশ্রয়দানের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এই কারণেই চাহিদা দেখা দিয়েছিল প্রাইভেট বস্তির, যার অনেকগুলিই ছিল সর্দারদের মালিকানাধীন। দু'ধরনের বস্তিই ছিল জনাকীর্ণ (overcrowded) অর্থাৎ তাদের আরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন ছিল, যা এই রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে।[৮]

যদিও মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টগুলিতে মিল কোয়ার্টারগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবাসস্থল হিসাবে দেখানো হয়েছে। পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ, পরিষ্কার পাকা ড্রেন এবং ঘরগুলির সামনে প্রশস্ত রাস্তা এবং সেপটিক ট্যাঙ্ক সংযুক্ত শৌচাগারের (latrine) কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ততটা রঙিন ছিল না।

ঘরগুলির আয়তন ছিল ১০ ফুট x ৮ ফুট। দুজন থাকার উপযোগী এই কোয়ার্টারগুলিতে ৬ জন মানুষ কোনক্রমে থাকত।[৯] হাওয়া-বাতাস খেলার উপযোগী কোনও ব্যবস্থা ছিলনা। এই কোয়ার্টারগুলিতে রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য পৃথক কোনও জায়গা ছিলনা। মহিলাদের কোনও নিজস্ব পরিসর (privacy) ছিল না। সম্ভবত এইসব কারণে চটকল গড়ে ওঠার প্রথম যুগে শ্রমিকরা সপরিবারে এই কোয়ার্টারগুলিতে আশ্রয় নিতনা।[১০]

স্বাধীনতাউত্তর পর্বে এই কোয়ার্টারগুলি গড়ে ওঠার প্রায় একশো বছর অতিক্রান্ত হলেও, এগুলোর কোন উন্নতি করা হয়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয় একদা যে কোয়ার্টারগুলিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তির চেয়ে উন্নত ও আবাসযোগ্য মনে করা হত, বর্তমানে সেগুলি প্রাইভেট বস্তির চেয়েও খারাপ অবস্থায় আছে। পক্ষান্তরে সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তিমালিকানাধীন বস্তি অঞ্চলগুলির অবস্থা ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পাকাবাড়ী, উন্নত পয়ঃপ্রণালী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা তথা পরিষ্কার জল সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বস্তির অঞ্চলে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করার মত।

ভাটপাড়া অঞ্চলে গড়ে ওঠা ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তিগুলির প্রাথমিক পর্বের এক বিক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যায় মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট থেকে। ভাটপাড়ায় এই রকম প্রাইভেট বস্তির সংখ্যা ছিল বিপুল। বস্তুতপক্ষে মিউনিসিপ্যালিটির ২নং ও ৩নং ওয়ার্ড এবং ১নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ ও পূর্ব অংশ এই ধরনের বস্তিতে পূর্ণ ছিল। ঘরগুলির দেওয়াল ছিল মাটির, ছাদ ছিল টালির। কালক্রমে মাটির দেওয়ালের পরিবর্তে ইটের দেওয়াল দেখা গেলেও, মেঝে ছিল কাঁচা ও স্যাঁতসেঁতে। ঘরগুলিতে আলো বাতাসের অভাব ছিল। পায়খানার ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। এই অবস্থায় এইসব অঞ্চলে সংক্রামক রোগ মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়া কিছু বিচিত্র ছিল না। মিউনিসিপ্যাল রিপোর্টে আরও বলা হয় যে, প্রস্তাবিত Town Improvement scheme চালু হলে বস্তিগুলির অবস্থার অবশ্যই উন্নতি ঘটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সব বস্তি মালিককে আলো হাওয়া খেলার মত উপযুক্ত জায়গা দিতে বাধ্য করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়।[১১]

এই প্রাইভেট বস্তিগুলিকে কেন্দ্র করে জাঁকিয়ে বসে জমিদারী ব্যবসাও। কারখানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির জমির মূল্য হুহু করে বাড়তে থাকে। দেখা গেছে যে, উক্ত সময়পর্বে এই অঞ্চল গুলিতে জমির মূল্য কুড়ি থেকে পঁচিশ গুণ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় বাঙালি জমিদারদের পাশাপাশি কারখানায় কর্মরত কিছু শ্রমিক যারা ক্রমশ চটকলে সর্দার রূপে আত্মপ্রকাশ করে তারাও উক্ত অঞ্চলে জমিদারী ক্রয় করতে থাকে। যদিও তখনও

তাদের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ খুবই অল্প ছিল।[১২] নতুন গড়ে ওঠা শিল্প শহরে শ্রমিকদের বাসস্থান ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কিত যেকোনও আলোচনা পৌর পরিচালনা (Municipal Affairs) ও পৌর রাজনীতির (Municipal politics) বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিত বাদ দিয়ে সম্ভব নয়।

নাগরিক পরিষেবা : কলকাতার উত্তর উপকণ্ঠে গঙ্গার পূর্বতীর বরাবর বরাহনগর থেকে নৈহাটি-ভাটপাড়া পর্যন্ত উনিশ শতকের শেষভাগে একের পর এক গড়ে উঠেছিল চটকল, পাশাপাশি ঘটেছিল নগরায়ণ এবং পুরসভা (বা মিউনিসিপ্যালিটির) প্রতিষ্ঠা। মিলগুলিকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের ব্যাপক আগমনের ফলে বাড়তে থাকল জনবসতির ঘনত্ব। এই অবস্থায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল নগর শাসনের মাপকাঠি। পানীয় জলসরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তায় আলো, পয়ঃপ্রণালী (drains) নির্মাণ, নলকূপ নির্মাণ এবং মহামারীর প্রতিষেধন প্রভৃতি হল পুরপরিষেবার প্রাথমিক শর্ত।

স্থানীয় বনেদি ভদ্রলোক স্বার্থ, ইউরোপীয় মিল মালিক ও ম্যানেজারদের স্বার্থ এবং বিপুলসংখ্যক পরিযায়ী শ্রমিকের স্বার্থ ছিল ভিন্ন ও অনেক সময়ই পরস্পর বিরোধী। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনা, কর্তৃত্ব এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি শ্রেণী ছিল মিউনিসিপ্যালিটির করদাতা (rate-payer) এবং ভোটদানের অধিকারপ্রাপ্ত, তৃতীয় শ্রেণীটি করদানও করত না, ভোটের অধিকারও ভোগ করত না। লক্ষ্যণীয় যে ইউরোপীয় মিল মালিক ও ম্যানেজাররা শ্রমিক অঞ্চলের রাস্তা চওড়া করা, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এমনকি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে হয়তো কিছুটা নিজেদের ব্যবসায়িক শ্রেণীস্বার্থ থেকেই তুলনায় সজাগ ছিল, কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকরা এসব ব্যাপারে উদাসীনতো ছিলেনই, এমনকি এসব খাতে খরচের বিরোধিতাও করতেন। যেহেতু মিলগুলি থেকেই মিউনিসিপ্যালিটির আয় সবচেয়ে বেশি হত, মিউনিসিপ্যালিটির নীতি নির্ধারণে ইউরোপীয় মিল মালিক ও ম্যানেজারদের জোরই বেশি ছিল। স্বাধীনতা উত্তর পর্বে ইউরোপীয় ম্যানেজারদের আস্তে আস্তে বিদায় সত্ত্বেও, চটকল শহরগুলির পৌরজীবনের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি অব্যাহত ছিল।[১৩] ভাটপাড়া পৌরসভা ও ঔপনিবেশিক আমলের পৌর রাজনীতির এই চালচিত্রের বাইরে ছিল না।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্টের প্রথম তপশিল অনুযায়ী ১৮৯৯ সালে ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় এবং প্রথমে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় ধরনের কমিশনাররাই ছিলেন সরকার মনোনীত। তাদের মধ্যে থেকেই চেয়ারম্যান (সাধারণত ইউরোপীয়) এবং ভাইস চেয়ারম্যান (সাধারণত ভারতীয়) উভয়ই সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন। পরবর্তীকালে বোর্ডের সদস্যদের নিজেদের মধ্য থেকেই ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। বোর্ডের সদস্যদের এমনভাবে মনোনয়ন দেওয়া হত, যাতে কর দাতাদের সব অংশেরই প্রতিনিধিত্ব থাকে।[১৪] প্রথমে কমিশনারের সংখ্যা ছিল ১৫; পরে ১৯২৪ সাল থেকে তা বাড়িয়ে করা হয় ১৯। একটি ওয়ার্ড থেকে একাধিক সদস্য মনোনীত হতেন।[১৫]

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ের প্রধান উৎস ছিল জমি ও বাড়ির উপর ধার্য ট্যাক্স থেকে। এই করদাতা বা Rate Payers-রাই মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য হতে পারতেন। মিল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি থেকেই সবচেয়ে বেশি কর আদায় হত এবং তারপর ছিল গৃহস্থ বাড়ির কর। কাজেই সম্ভবতই মিউনিসিপ্যালিটিতে মিল মালিকদের আধিপত্য বেশি ছিল। ১৯২৫ সালের মিউনিসিপ্যাল রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, আদি ভাটপাড়া এবং মূলাজোড় অঞ্চল যা প্রধানত বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল সেখান থেকে তুলনায় কম কর আসত। অন্যদিকে কাঁকিনাড়া ও জগদ্দল যেখানে অধিকাংশ মিলগুলি অবস্থিত, সেখান থেকেই বিপুল সংখ্যক কর আসত এবং শ্রমিকদের বিপুল বসতিও ছিল এই অঞ্চলে। কিন্তু তুলনায় এই অঞ্চল থেকে পুরবোর্ডে কমিশনারের সংখ্যা ছিল কম। এই সময় দাবি উঠতে থাকে যে, আদি ভাটপাড়ায় একটি আলাদা পুরবোর্ড (অথবা তাকে নৈহাটি পৌরসভার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হোক) এবং জগদ্দল-কাঁকিনাড়া নিয়ে একটি আলাদা পৌরসভা গঠন করা হোক।[১৬] অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। যে ১৯জন কমিশনারকে নিয়ে ভাটপাড়া পুরবোর্ড এই সময়ে গঠিত হত, তাদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন মিল ও মিলের শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী। অন্যান্যদের মধ্যে ৭ জন হিন্দু করদাতাদের, ২ জন মুসলিম করদাতাদের, ১ জন রেলওয়ের প্রতিনিধি।[১৭] পরে অন্যান্য করদাতাদের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন করে ১ জন জমিদারদের প্রতিনিধি, ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, ৫ জন হিন্দু করদাতাদের ও ১ জন মুসলিম করদাতাদের প্রতিনিধি করা হয়।[১৮] ১৯৩০ এর দশক থেকে অনেক শ্রমিক সর্দার জমিবাড়ির মালিক হওয়ার সূত্রে করপ্রদানকারী হন এবং তাদের মধ্য থেকে ২ জনকে পুরবোর্ডের মনোনয়ন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

১৯২৭ সালে বার্ষিক পৌর রিপোর্টে ভাটপাড়াকে 'the most populous and the most congested of all the mofussil town' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পৌর পরিষেবার প্রসঙ্গে বলা যায়, ১৯২০ ও ১৯৩০ এক দশকের বার্ষিক পৌর রিপোর্টে পৌর পরিষেবার যেসব ক্ষেত্রের কথা বারবার উঠেছিল তার মধ্যে ছিল-

রাস্তাঘাট : রাস্তা নিয়মিত ধোওয়া ও পরিষ্কার করা। মিল অঞ্চলে এবং গৃহস্থ বাড়িতে সেটা যতটা করা হত, ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে তা স্বভাবতই সম্ভব ছিল না।

পরিশ্রুত জল : বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মিলগুলির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী মিলগুলি নিজ খরচে পরিশ্রুত জল উৎপাদন করত এবং তা সরবরাহের দায়িত্ব ছিল পৌরসভার। কিন্তু শ্রমিক বস্তিতে জলের পাইপ বসানো এবং উপযুক্ত চাপের (pressure) অভাবের কথা বারবার স্বীকার করা হয়েছে।[১৯] তারপরে অবশ্য অবস্থার উন্নতির কিছু চেষ্টা হয়।

স্ট্রীটলাইট : রাস্তায় বাতিস্তম্ভ থেকে কেরোসিনের কুপিতে রাত্রিবেলা আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

Conservancy (ময়লা অপসারণ) : গৃহস্থ বাড়ি থেকে নিয়মিত জঞ্জাল অপসারণ।

Drainage (জল নিষ্কাশন) : প্রথমে ভাটপাড়া অঞ্চলে এবং পরে জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া অঞ্চলে পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বাস্থ্যপরিষেবা : স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলা যায় যে প্রায় সব মিলেই সংলগ্ন ডিসপেনসারী ছিল, যেখানে প্রশিক্ষিত চিকিৎসক থাকতেন। শ্রমিকরা সেখানে চিকিৎসা ও ওষুধের সুযোগ পেত। কিন্তু কোন ইনডোর ডিসপেনসারী ছিলনা। পুরুষ শ্রমিকরা সাধারণভাবে মিলের ডিসপেনসারীতেই যেত। মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব একটি outdoor female charitable dispensary ছিল। এছাড়া আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। মিউনিসিপ্যাল রেকর্ডেস্বীকার করা হয়েছিলযে, যে হারে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ছে এবং মিলশহর অতি জনাকীর্ণ (over congested) হয়ে পড়ছে, সেখানে কলেরা বা বসন্তের মত রোগ খুব সহজেই মহামারীর আকার ধারণ করত। টীকাদান (vaccination) সহ অন্যান্য ব্যবস্থা থাকলেও, তা ছিল অপ্রতুল। শ্রমিকদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব ছিল।

শিক্ষাব্যবস্থা : শিল্পশহরের শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে, Bengali Primary Education Act (১৯১৯) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলা হলেও, ভাটপাড়ার মত শিল্পশহরে সেকথা ভাবাই হয়নি। এখানে মিউনিসিপ্যালিটির নিজস্ব কোন স্কুল ছিল না। অধিকাংশ শ্রমিক পরিযায়ী চরিত্রের (floating population) ছিল। যারা কিছুটা স্থায়ীভাবে বসবাস করত তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই সপরিবারে থাকত বা থাকলেও সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তবে বেশ কিছু প্রাইমারী (হিন্দী, উর্দু ও বাংলা মাধ্যম) প্রাইভেট স্কুল ছিল এবং পৌরসভা তাদের কিছু আর্থিক অনুমান দিত। কয়েকটি ভালো মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা করে, সহশিক্ষামূলক নয়) ছিল। মিলের মধ্যেও কিছু স্কুল ছিল, কিন্তু সে সবই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য। পৌর রিপোর্টে এই অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করা হলেও, তার কোনও সংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না।

সামগ্রিক পৌরচিত্র

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ১৯২৬ সালের পৌর রিপোর্টে কাঁকিনাড়া-জগদ্দল অঞ্চলে, যেখানে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের বাস, জল সরবরাহের অপ্রতুল্যতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। এর থেকে মহামারীর আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। বস্তি অঞ্চলে রাস্তা পাকা করা ও পরিসর বৃদ্ধির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। বাঙালি জমিদারদের তুলনায় ইউরোপীয় মিল মালিকদের শিল্পশহরের আধুনিকীকরণে অনেক বেশি উৎসাহের কথা বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে শ্রীরামপুরের জমিদার, যাদের এই বস্তি অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ জমি ছিল, সেই পরিবারের সন্তান ও বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা তুলসীচরণ গোস্বামীর কথা। বস্তি অঞ্চলে sewrage (পয়প্রণালী) নির্মাণের জন্য তাঁর জমিদারীর অংশ থেকে জমি নিতে আপত্তি ও বাধাদানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কিন্তু সবরকম দুর্বলতা ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক আমলে পৌর কাঠামোর কিছু সদর্থক দিক একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ঔপনিবেশিক আমলে পৌর পরিষেবার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল Town Improvement Scheme, ১৯২০ ও ৩০ এর দশকে যার অধীনে পানীয় ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার্য পরিশ্রুত জল সরবরাহ, সুয়ারেজ ও সুয়ারেজ ডিসপার্সাল, কাঁকিনাড়া ও জগদ্দলের শ্রমিক বস্তির ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে রেহাই দিতে রাস্তা ও পার্ক নির্মাণ এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় রাস্তা (central road) নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছিল। এইগুলি রূপায়নে পৌরসভা, মিল কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের যৌথ বিনিয়োগ (investment) ও সরাসরি সরকারী উদ্যোগে তা সম্পাদিত হয়েছিল।[২০]

এসব কিছু সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে পৌরসভার কোনও কর আদায় করা যাচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত পৌর পরিষেবা বৃদ্ধির গুরুত্ব নীতিগতভাবে স্বীকার করা হলেও, তার বাস্তবায়নে ততটা উৎসাহ দেখান হয়নি এবং তার সঙ্গে শ্রমিকদের ভোটাধিকার দানের প্রশ্নটিও জড়িয়ে যায়। এর ফলে স্থানীয় অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য নাগরিকদের মত অধিকার ও মর্যাদা শ্রমিকদের ঔপনিবেশিক আমলে ছিল না। ভাটপাড়া পুরঅঞ্চলেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯২১ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত ভাটপাড়া পৌরসভার করদাতার সংখ্যা (rate payers) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোট করদাতার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক ভগ্নাংশ ছিল মাত্র। ১৯২১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যেখানে শহরের জনসংখ্যা ছিল ৬৫,৬০৯, সেখানে করদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৩৩৩ অর্থাৎ মাত্র ৪.৯ শতাংশ (দ্রষ্টব্য অধ্যায় পরিশেষে সংযোজিত সারণী নং-২)।[২১] জনগণনা অনুযায়ী পুরুষ ও নারীর অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৭:৩, যা শহরের শ্রমিকদের অস্থায়ী পরিবারবিহীন পরিযায়ী চরিত্র (temporary single migrant character) প্রমাণ করে। ১৯২৪ সালের পৌর রিপোর্টে স্পষ্টই বলা হয় যে,"একথা স্বীকার করা যেতেই পারে যে, শহরে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, করদাতার সঙ্গে মোটেই সেই অনুপাতে বাড়ছেনা। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, এই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ ছিল চটকলের কুলি, যাদের নিজস্ব কোনও বাসস্থান ছিল না। তারা মিল কোয়ার্টর বা প্রাইভেট বস্তিতে বসবাস করত এবং প্রকৃত অর্থেই তাদের ভাসমান জনসংখ্যা বা floating population বলা যেতে পারে।[২২]

অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ভাটপাড়ার চটকল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান ছিল অত্যন্ত শোচনীয়, যা নিচের দুটি সারণী থেকে পরিষ্কার। প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরে সময়ের এই সারণী থেকে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন চটকল শ্রমিকরা তাদের আয়ের সিংহভাগ দেশে গ্রামের পরিবার প্রতিপালনের জন্য

পাঠাত, তেমনি তাদের স্বল্পবেতন, থাকার জায়গার অপ্রতুলতা ও ঘিঞ্জি পরিবেশ এই শিল্প শহরে তাদের দৈনন্দিন শোচনীয় অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় বহন করত।

তৎকালীন ভাটপাড়া পৌরসভার অন্তর্গত ৪টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতেই একটি করে পোস্ট অফিস ছিল। বহিরাগত শ্রমিক অধ্যুষিত হওয়ায় এবং তাদের দেশে টাকা পাঠানোর মানি অর্ডারের হিসাব থেকেই চিত্রটা পরিষ্কার হয়। নমুনা হিসাবে তিন বছরের (১৯১৮, ১৯১৯ ও ১৯২০ সাল) হিসাব তুলে ধরা হল।

সারণী- ২

Statement of Money orders issued From the Four Post Offices within the Municipality

Name of Post Office	No. of Money Orders Issued			Amount of Money Orders Issued (Amount in Rs.)		
	1918	1919	1920	1918	1919	1920
Bhatpara	13,399	13,714	18,486	2,07,425	1,78,826	2,90,620
Kankinara	19,291	20,521	24,582	2,87,331	2,59,267	4,13,736
Jagatdal	24,300	23,238	29,703	3,79,203	2,91,506	4,83,887
Shyamnagar	4,599	5,684	7,329	52,024	55,587	80,370

Source : Bhatpara Municipality, Annual Administration Report, 1922, p. 14.

আবার প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন একটি বছর (১৯১৫) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী একটি বছরের (১৯২৩) ভাটপাড়ার বিভিন্ন চটকলে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা, শ্রমিকদের মোট থাকার ঘরের সংখ্যা এবং শ্রমিকদের মোট মাসিক মজুরির পরিমাণ নিম্নলিখিত নিম্নলিখিত সারণি থেকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হল।

সারণী- ৩

ভাটপাড়া অঞ্চলের অন্তর্গত জুটমিল ও কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা

	শ্রমিক সংখ্যা (১৯১৫)	শ্রমিক সংখ্যা (১৯২৩)	শ্রমিকদের থাকার ঘর (১৯২৩)	মাসিক মজুরি (১৯১৫)	মাসিক মজুরি (১৯২৩)
রিলায়েন্স জুট মিল	৫৯৩৬	৮৩০০	১৪৬	৬০৬০০	১৫৩০৯১
কাঁকিনাড়া জুট মিল (এ+বি)	৮০০০	৮১০০	১৩৬৮	৯০০০০	১৩৫০০০
অ্যাংলো ইন্ডিয়া আপার মিল	২৮৪৭	৩৫৮৭	৮৬০	৩৮৩৫৪	৬৩৪৩১
অ্যাংলো ইন্ডিয়া মিডলমিল	৪৫০০	৫০৩০	৪৬৫	৫৬০০০	৮৯০০০
অ্যাংলো ইন্ডিয়া লোয়ারমিল	২৫০০	৩৩০০	৬৪১	৩৫০০	৫৪৩৪৪

অ্যাংলো ইন্ডিয়া জগদ্দল মিল	২৬৫	৩৩৯০	২৫০	৩৪৭৭	৬৬০০
অ্যালায়েন্স জুট মিল নর্থ + সাউথ	৬৩৩৬	৬০৭৪	১০২৩	৮৮২০০	১১৬৪০০
আলেকজান্দ্রা মিল	চালুহয়নি	২২০৯	৪৬৪	৩৪০০০	৪০২০০
ওয়েভারলি জুট মিল	চালুহয়নি	১৬০০	৪০০	x	৩৮১০০
দি ক্রেগ মিলস	চালুহয়নি	১৩৯৫	x	x	২৯৪১০
অকল্যান্ড মিল	১৬৯০	৫০০০	৯৬০	৪১৬৮০	৮১৯৫৬

সূত্র: পরেশপাল, শতবর্ষের ভাটপাড়া পুরসভা, স্মরণিকা, ভাটপাড়া শতবার্ষিকী, ১৯৯৯।

ঔপনিবেশিক আমলের শেষের দিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও তার অব্যবহিত পরেও শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার ক্ষেত্রে খুব বড় মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। ভাটপাড়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় দুটি নমুনা সমীক্ষা থেকে (sample survey)। ১৯৪০-৪১ সালে Bengal LabourEnquiry-র অংশ হিসাবে Board of Economic Enquiry Bengal এর উদ্যোগে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে জগদ্দল লেবার এনকোয়ারী (১৯৪১) পরিচালিত হয়দুটিনমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে। প্রথমটি ডিসেম্বর, ১৯৪০ থেকে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ এবং দ্বিতীয়টি অক্টোবর, ১৯৪১ থেকে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে। পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে চটকল মজদুর ইউনিয়নের অনুরোধে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিক্যাল ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায় এবং এইচ. কে. চতুর্বেদীর পরিচালনায় জীবনযাত্রার সূচক সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম তথ্য সংগ্রহীত হয়। এক কথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে সংগৃহীত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে দুটি নমুনা সমীক্ষার পদ্ধতির মধ্যে খুঁটিনাটি কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও, ব্যয় নির্বাহের (expenditure pattern) ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন যে পরিবর্তনগুলি এসেছিল তা স্পষ্ট।

১) উভয় সময়েই আয়ের সিংহভাগ যেত আনুপাতিক ও অংকের হারে, দুভাবেই খাদ্যদ্রব্যের পিছনে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেত cereal বা তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য (চাল, গম ইত্যাদি), ডাল ও আলুর পেছনে। রান্নার তেল, ঘি বা মশলার জন্য ব্যয় ছিল যৎসামান্য। দুধ, ডিম, মাছ ও মাংসের মত প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের জন্য ব্যয় ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই সময়কালে ব্যক্তিগত ও পরিবার পিছু ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও, এই সময়কালের মধ্যে (১৯৪১-৪৫) মূল্যসূচক এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সব ধরনের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমেছিল।

২) খাদ্যের পরেই ব্যয় হত বস্ত্রের পেছনে। মূল্যবৃদ্ধির ফলে কোপ পড়ে বস্ত্র ব্যবহারের উপর। নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের ধরনের (pattern) ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। মেয়েদের ক্ষেত্রে শাড়ি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ধুতি, লুঙ্গি, পায়জামা, গামছা ও গেঞ্জির মত হোসিয়ারী দ্রব্য ব্যবহৃত হত। প্রায় সব ধরনের পোশাকেরই কয়েক

গুণ দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে পুরুষের পোষাকের পরিমাণ কমে যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয়ভাবে মহিলাদের শাড়ির পরিমাণ ও আনুপাতিক ব্যয় দুই'ই বৃদ্ধি পায়। সম্ভবত এর কারণ ছিল গ্রামাঞ্চলে বস্ত্রের প্রায় দুর্ভিক্ষ চলছিল। তার ফলে শ্রমিকরা গ্রামে বসবাসকারী তাদের পরিবারের মহিলাদের জন্য শাড়ি কিনে পাঠাতে বাধ্য হত।

৩) খরচার নিরিখে তৃতীয় স্থানে ছিল জ্বালানি ও আলো (lighting)। মূলত এর মধ্যে পড়ত কেরোসিন। রান্নার প্রয়োজনেই কেরোসিনের সিংহভাগ ব্যয়িত হত। তার ফলে সন্ধ্যার পর শ্রমিকরা সাধারণত অন্ধকারে বা খুব অল্প আলোয় দিনযাপন করত।

অন্যান্য খরচের (miscellaneous) মধ্যে ছিল পান, তামাক, খৈনি ও মদের মত নেশার জিনিসও অন্যান্য কিছু গৃহস্থালী জিনিসপত্রের পেছনে খরচ। প্রয়োজনমত অত্যাবশ্যক চিকিৎসা, পুরনো ধার পরিশোধ, দেশে যাওয়া আসার এবং ডাক (postal) খরচ ইত্যাদি। অবসর বিনোদন (recreation) বা শিশুদের শিক্ষার (educational purpose) খরচ প্রায় ছিলই না।

Housing অর্থাৎ মিল কোয়ার্টার বা প্রাইভেট বস্তি বাড়ির ভাড়া (rent and tax) যুদ্ধকালে খুব একটা পরিবর্তিত হয়নি বরং সামান্য হ্রাস পায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং যুদ্ধের পরে ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাসস্থানের জায়গা আরও সংকুচিত হয় এবং আরও গাদাগাদি করে শ্রমিকদের থাকতে হয়। ব্যবহারযোগ্য মাথাপিছু আয়তন (floorspace) আরও কমতে থাকে। কাজেই, ১৯৪১ সালে যুদ্ধের শুরুতে জগদ্দলের চটকল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান ছিল ন্যূনতম (minimum standard of living) এবং যুদ্ধের শেষের দিকে ও তার কোনও পরিবর্তন হয়নি।[২৩]

ভাটপাড়া শিল্প শহরের শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবন সম্বন্ধে আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে, স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত আগেও অবাঙালি শ্রমিকরা ছিল অভিবাসী, অস্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং নিজেদের দেশের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমে-ক্রমে শিথিল হলেও, তা মোটেই বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং ধীরে ধীরে অল্প সংখ্যক শ্রমিক সপরিবারে এই শিল্পনগরীতে বসবাস করতে শুরু করেছিল।

তথ্যসূত্র :

১. Bhatpara Municipality, Annual Administration Report, 1925-26, p. 1.

২. পরেশ পাল, শতবর্ষের ভাটপাড়া, ভাটপাড়া পৌরসভা ১৮৯৯-১৯৯৯ শতবর্ষের স্মারক পুস্তিকা, ভাটপাড়া পুরসভা ১৯৯৯, পৃ. ১।

৩. ভাটপাড়া পৌর প্রতিবেদন, ২০০০, পৃ. ২।

৪. পরেশ পাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩; এবং সমরেশ বসু, জগদ্দল, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), সমরেশ বসু রচনাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ৬৬-৬৯।

৫. Bhatpara Municipality, ibid, 1922, p. 2.

৬. Bhatpara Municipality, ibid, 1923-30.

৭. Bhatpara Municipality, ibid, 1925-26, p. 17.
৮. Bhatpara Municipality, ibid, 1926-27, p. 22-25.
৯. Bhatpara Municipality, ibid, 1926-27, p. 7.
১০. Bhatpara Municipality, ibid, 1929-30, pp. 29-31.
১১. Bhatpara Municipality, ibid, 1928-29, p. 27
১২. Bhatpara Municipality, ibid, 1929-30, p. 3
১৩. সৌমিত্র শ্রীমানী, 'মিউনিসিপ্যালিটি ও মিল: বরানগর ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ', ইতিহাস অনুসন্ধান, খণ্ড-১১, ১৯৯৬।
১৪. Bhatpara Municipality, ibid, 1922, p. 2.
১৫. Bhatpara Municipality, ibid, 1924-25, pp. 1-2.
১৬. Calcutta Gazette, 16th July, 1924, Government of West Bengal, Notification No. 3242 M., Dated 8th July.
১৭. Bhatpara Municipality, ibid, 1926-27, p. 2.
১৮. Bhatpara Municipality, ibid, 1929-30, p. 2.
১৯. Bhatpara Municipality, ibid, 1925-26, p.12.
২০. ভাটপাড়া পৌরসভা, মে দিবস শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা, ভাটপাড়া পৌরসভার প্রদর্শনী মণ্ডপ স্থাপন উপলক্ষে প্রকাশিত, ১৯৮৬, পৃ. ১৪।
২১. Bhatpara Municipality, ibid, 1923-24, p. 3.
২২. ibid, 1923-24, p. 3
২৩. H. K. Chaturvedi and S. Bhattacharya (article), 'On the change in Standard of Living of the Jute Mill Workers of Jagaddal between the Years 1941 and 1945' in Sankhya, The Indian Journal of Statistics, Published by the Indian Statistical Institution, Vol. 8, No-4, July, 1948) also, K. P. Chattopadhyay, A Socio-Economic Survey of Jute Labour, Calcutta, 1951.